



ଜୀବ ଶିକ୍ଷା

ଅକ୍ଷିତବହୁ



ଶିକ୍ଷା ଆଧିକାର

ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ

ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ

• ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୧

ପ୍ରଥମ ମଂଥା

পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষা-অধিকর্তার
অভিবাদন-সহ

মহাপুরুষ-বাণী



এদেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী অমাহারে ও অজ্ঞতার দিন কাটাইতেছে, অথচ ইহাদেরই বোলতে বাহারা শিক্ষাদীক্ষার সমাজে গণ্যমান্য হইয়া ইহাদের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করাও প্রয়োজন মনে করে না.—আমি সেই শ্রেণীর আত্মসর্বশ্রম লোকদিগকে দেশজোহী বলিয়া অভিযুক্ত করি।
—বামী বিবেকানন্দ



যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে
বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেও যারে সে তোমারে
পশ্চাতে টানিছে।

—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ



দেশের শাসন-ব্যবস্থা নিরপ্রণেয়
অধিকার এবং ক্ষমতা। সম্বন্ধে জনগণকে
সজাগ ও সচেতন করিয়া তুলিলেই
প্রকৃত স্বরাজ অর্জিত হইবে।

—মহাত্মা গান্ধী

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের শ্রাভক্ষা

পুঁথিগত বিদ্যা আশ্রমের দেশে অতি-বিস্তার লাভ না করিলেও
আশ্রমের জনগণের শীলতা ও সংস্কৃতিতে যে সার্বিক জনশিক্ষার ব্যাপক
পরিচয় পাওয়া যায় না তাহা নহে। কিন্তু আধুনিক জগতের নিত্য
বিকর্তনের ও প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া চলিবার
উপযোগী শিক্ষা যে এদেশে বহুবিস্তার লাভ করে নাই ইহা সত্য।
স্বাধীন ভারতের নাগরিকগণের গুরু দায়িত্ব সম্পাদনের সহায়তার
জন্য সেই শিক্ষার দৈন্য অচিরে দূর করিবার তাগিদ আদিয়াছে।
স্কুল-কলেজের শিক্ষার মাধ্যমে তাহা আয়ত্ত করিবার জন্য অপ্রাপ্তবয়স্ক
ভাৰো 'নাগরিকেরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে ও করিবে। কিন্তু
প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনে প্রবেশের সুযোগ যাহারা পায় নাই আজ
তাহাদের নিরক্ষরতা দূর ও সামাজিক জ্ঞান প্রদানের জন্য বয়স্ক
দিগের শিক্ষার দায়িত্ব-যাহারা গ্রহণ করিয়াছেন "জনশিক্ষা" তাঁহাদের
বাণী বহন করিয়া ফিরিবে। প্রার্থনা করি, জনশিক্ষার সে প্রচেষ্টা
সফল হউক। ইতি

জীরার হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

মূচীপত্র

মাননীয় শিকামন্ত্রী মহোদয়ের শুভেচ্ছা—

নিবেদন

লেখাপড়া শিখিব কেন ?

আমাদের দেশ—ঐশ্বরিকুমার নিয়োগী

পৃথিবীর ক্ষয়কথা—ঐমদ্বন্দ্বনাথ রায়

খোকার বই—ঐবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

পথঘাট সাফ রাখ—ঐনির্মল দাশ

জুথের নদী—ঐনারায়ণচন্দ্র চন্দ্র

জেন-শিক্ষা



জ.

পা.

বিক্র. ম. বর্ষ

উ.

মাঘ ১৩৫৭

প্রথম সংখ্যা

নিবেদন

১৯৪৯ সনের ১৫ই আগস্ট তারিখ হইতে পশ্চিম বঙ্গ গভর্নমেন্টের জনশিক্ষা-পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন জেলায় ৫০৮টি জনশিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই পাঁচশত আটটি কেন্দ্রের একশতটি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্র এবং বাকী চারিশত আটটি লিটারেসি অথবা অক্ষরপরিচয় কেন্দ্র। প্রত্যেক কেন্দ্রেরই প্রাথমিক কাজ হইতেছে নিরক্ষর বয়স্ক নরনারীকে সাক্ষর করিয়া তোলা। অক্ষর-পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিধি, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় সংক্ষেপে মৌখিক শিক্ষা ও আলোচনা-আলোচনার ব্যবস্থাও রহিয়াছে। সরকারী প্রচার বিভাগের জেলা কর্মচারীদের সহায়তায় গ্রামে গ্রামে এবং জনশিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে শিক্ষাবিষয়ক চলচ্চিত্র দেখান হইয়া থাকে। সরকারী সাহায্যে নানা জায়গায় যাত্রা, কীর্তন, কথকতা ইত্যাদি শিক্ষামূলক আন্দোলন-প্রমোদের ব্যবস্থাও করা হয়। পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রগুলিতে ছুই জন করিয়া শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। এক জনের কাজ আক্ষরিক শিক্ষা দেওয়া, ইহাকে বলা হয়

লিটারেসি টিচার বা অক্ষর-শিক্ষক। অপর জনের কাজ উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সাধারণ উপদেশ দেওয়া, ইহাকে বলা হয় স্তোমাল এডুকেশন ওয়ার্কার অথবা সমাজ-শিক্ষা কর্মী।

এই কর্মীরাই জনশিক্ষা-কেন্দ্রগুলির কাজ পরিচালনা করেন। ইহাদের কাজ পরিদর্শন করিবার ভার জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং তাঁহার অধীনস্থ সমাজশিক্ষা প্রাধিকারিকের উপর স্তব্ধ রহিয়াছে। প্রত্যেক গ্রামে বা শহরে যেখানেই একটি জনশিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, সেখানেই স্থানীয় শিক্ষাব্রতী ও অন্যান্য কয়েক জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে লইয়া একটি উপদেষ্টা সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতির কাজ স্থানীয় জনশিক্ষা-কেন্দ্রটির সংগঠন ও মঠ পরিচালনা। স্থানীয় সমিতির ন্যায় প্রত্যেক জেলার সদরেও একটি জেলা উপদেষ্টা সমিতি এবং সর্বোপরি সমগ্র রাজ্যের জন্য একটি সমাজশিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড নিযুক্ত হইয়াছে। জনশিক্ষা প্রসার ব্যাপারে সরকার বাহাদুর এবং শিক্ষাবিভাগীয় কর্মচারিগণকে উপদেশ ও সাহায্য দান করাই এই সব সমিতি ও বোর্ডের প্রধান কাজ।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে নূনপক্ষে তিন মাস সময় ভালভাবে চেষ্টা করিলেই এক জন নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তি ছোটামুটি লেখাপড়া শিখিয়া লইতে পারে। সেই হিসাবে আমাদের কেন্দ্রগুলিতে প্রতি তিন মাস অন্তর আক্ষরিক পরীক্ষা গ্রহণ করিবার রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্ম মাথাপিছু যথাক্রমে এক টাকা ও দুই টাকা পারিতোষিক হিসাবে কেন্দ্রের শিক্ষক মহাশয়কে দেওয়া হইয়া থাকে। ১৯৪৯ সনের ১৫ই আগস্ট হইতে হিসাব করিলে ১৯৫০ সনের ১৪ই মে তারিখ পর্যন্ত মোট নয় মাসে তিন বার পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে। এই পরীক্ষার ফলাফল হইতে জানা গিয়াছে যে, এই নয় মাসে কিকিমান্বিত ৩২,৯০০ জন নিরক্ষর নরনারী আমাদের কেন্দ্রগুলিতে যোগদান করিয়াছিল

এবং তাহাদের মধ্যে প্রায় ১৭,৪০০ জন সাক্ষর বলিয়া ঘোষিত হয়। গড়ে শতকরা প্রায় ৫২ জন সাক্ষর লাভ করিয়াছে।

গভর্নমেন্ট-কর্তৃক পরিচালিত কেন্দ্র ছাড়াও নানা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আরও প্রায় তিন শত নৈশ বিজ্ঞান্য বা বহুদলের শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করিতেছেন। বেসরকারী কেন্দ্রগুলি হইতেও প্রতি তিন চার মাস অন্তর কিছু কিছু লোক সাক্ষর হইয়া উঠিতেছে।

এখন একটা খুব বড় প্রশ্ন হইতেছে এই যে, কি উপায়ে এই সচ্চ-সাক্ষর নরনারীর পরবর্তী শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। পরবর্তী শিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ছাড়া জনশিক্ষা প্রসার কিছুতেই স্থায়ী এবং ফলপ্রসূ হইতে পারে না। সদ্যশিক্ষাপ্রাপ্ত নরনারীর উপযোগী সাহিত্য রচনা জনশিক্ষা-আন্দোলনের একটি প্রধান অঙ্গ। সৌভাগ্যক্রমে বাংলা সাহিত্যে পুস্তক-পত্রিকার অভাব নাই। কিন্তু বাজারে প্রচলিত অসংখ্য পুঁথিপত্রের মধ্যে সচ্চ-সাক্ষর নরনারীর উপযোগী পাঠ্য বইয়ের সংখ্যা যে খুব বেশী আছে তাহা বলা যায় না। সম্প্রতি, বিশেষ করিয়া সরকারী জনশিক্ষা-পত্রিকল্পনা কার্যকরী হইবার পর হইতে এই জাতীয় সাহিত্য কিছু কিছু রচিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার পুরিমাণ এখনও অকিঞ্চিৎকর। এই জাতীয় সাহিত্যের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। জনশিক্ষা-আন্দোলনের ক্রম-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার চাহিদা আরও বাড়িবে।

পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষা অধিকার-কর্তৃক প্রকাশিত এই মাসিক পত্রিকা—‘জনশিক্ষা’ উক্ত চাহিদা মিটাইবার প্রথম প্রয়াস। এই পত্রিকায় সচ্চ-সাক্ষর নরনারীর উপযোগী সহজ ও সরল ভাষায় রচিত কবিতা, প্রবন্ধ, সংবাদ, গল্প প্রভৃতি নিয়মিত প্রকাশিত হইবে। জনশিক্ষা-কেন্দ্রের কর্মী ও শিক্ষাখিগণের রচনা বিশেষ সমাদরের সহিত ‘জনশিক্ষা’য় প্রকাশিত হইবে।

এই পত্রিকাটিকে সার্থক ও সর্বাসম্প্রদর করিয়া তুলিবার জন্য আমরা
প্রত্যেক শিক্ষাব্রতী ও দেশহিতৈষীকে সাদর আহ্বান জানাইচ্ছ।

ভারত হিন্দ

খনার বচন

আছে গরু না বয় হাল ।

তার দুঃখ চিরকাল ॥

. . .

বাপ বেটার চাষ চাই ।

তার অর্ধেক সোদর ভাই ॥

খাটে পাটায় লাভের গাঁতি ।

তার অর্ধেক কাঁধে ছাতি ॥

ঘরে বসে পুছে বাত ।

তার ঘরে 'হা ভাত' ॥

✓লেখাপড়া শিখিব কেন ?

আমরা বলি আমাদের দেশ 'সকল দেশের সেরা'। সকলেই নিজ নিজ দেশকে ভালবাসে এবং নিজের দেশের কথায় গৌরব বোধ করে ;
আমরাও করি।

কিন্তু বড় ছুঃখের কথা যে, আমাদের দেশে শতকরা কেবল কুড়ি জন লোক কিছু লেখাপড়া জানে, বাকী আশী জনই একেবারে মূৰ্খ।

চোখ না থাকিলে আমরা যেমন দেখিতে পাই না এবং কান না থাকিলে আমরা যেমন শুনিতে পাই না, ঠিক তেমনি লেখাপড়া না জানিলে আমরা অনেক কাজই ঠিক মত করিয়া উঠিতে পারি না। পদে পদে লোকের কাছে ঠকিতে হয়, মূৰ্খ বলিয়া লোকে অবহেলা করে।

জগতে জঁনিবার ও বুঝিবার কত নূতন বিষয় রহিয়াছে। কিন্তু নিজে পড়িতে না পারিলে কেবল পরের মুখে শুনিয়া কি সব কিছু জানা যায় ? তাই সংসারে পদে পদে লেখাপড়া জানা দরকার।

বাড়ীতে একখানা ডাকের চিঠি আসিয়াছে। কিন্তু কেহ তাহা পড়িতে পারে না। তাই ছোট অপরের কাছে। অপরে চিঠিখানা পড়িয়া শুনাইবে তবে চিঠির খবর জানিবে। যাহার কাছে যাও সে নাও পড়িয়া দিতে পারে, হয়ত ভুলও পড়িতে পারে অথবা ছুটা কটু কথাও শুনাইয়া দিতে পারে। একখানা চিঠি পড়াইবার দরুণ কি হুয়রানি !

চাষী মহাজনের নিকট হইতে টাকা ধার লইয়াছে। চাষী লেখাপড়া জানে না, তাই দেনার খতে নাম-মইয়ের বদলে টিপ-মই করিয়া দিল, খতে কি লেখা আছে তাহাও জানিতে পারিল না। আর সেই স্বযোগে ধূর্ত মহাজন আসলে ১০০ একশ টাকা দিয়া ৫০০ পাঁচশ টাকার খতে চাষীর টিপ-মই

লইল। ফল কি হইল সহজেই বুঝা যায়। সেই মেনার হৃদয় তার হৃদয় বাড়িয়াই চলিল। চাষী আর মেনা শোধ করিতে পারিল না, ফলে তাহার বাড়ী-ঘর, জমি-জমা সব কিছুই মেনার দায়ে নিলাম হইল। জমির মালিক চাষী জমিহীন মজুর বনিয়া গেল।

আজকাল আর এরকম হইতে পারে না। কারণ সরকার বাহাদুর ঋণ মালিন্দী সমিতি গঠন করিয়া চাষীর ঋণ শোধের সহজ উপায় করিয়া দিয়াছেন। আবার সমবায় সমিতি হইতে বিনা সুদে বা খুব কম সুদে ঋণ পাইবার উপায়ও রহিয়াছে।

কিন্তু ভাবিয়া দেখ শুধু লেখাপড়া না জানার দরুন কত চাষী পরিবার মেনার দায়ে কিরূপ বিষম বিপদে পড়িয়াছে।

বিদেশে যাইতে হইলে রেলগাড়ী অথবা জাহাজে চড়িতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় লেখাপড়া-না-জানা লোকেরা ভুল করিয়া যে জায়গায় যাইবে সেখানকার গাড়ীতে না চড়িয়া অপর গাড়ীতে চড়িয়া বসিয়াছে। ইহার ফলে তাহাদিগকে কম নাকাল হইতে হয় না।

বাড়ীতে ছেলের অস্থব। হাসপাতাল হইতে ঋণগ্রস্ত ও মালিশ করিবার দুই রকম ঐষধ আনা হইয়াছে। মালিশের ঐষধের শিশির গায়ে লেখা আছে “বিষ”। কিন্তু মা লেখাপড়া জানেন না। ভুল করিয়া মালিশের ঐষধ ছেলেকে খাওয়াইয়া দিলেন। ফল হইল বিষময়। বিষ খাইয়া ছেলেটি মারা গেল। আদরের ছেলেকে হারাইয়া মা শোকে পাগলের মত হইলেন। এইরূপ ঘটনা আমাদের দেশে বহু ঘটিয়াছে, এখনও ঘটে।

ভারতবর্ষে, হাটে বাজারে, সরকারী অফিসে, আদালতে—কোনখানেই লেখাপড়া না জানিলে চলে না। আর লেখাপড়া শেখা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। অনেকে মনে করেন যে ছেলেবেলায় লেখাপড়া না শিখিলে বেশী বয়সে আর লেখাপড়া শেখা যায় না। একথা ভুল। অনেক সময়েই

দেখা যায় যে বেশী বয়সের লোকেরাও খুব তাড়াতাড়ি ও ভালভাবেই লেখাপড়া শিখিতে পারিয়াছে। মহাকবি কালিদাসের কাহিনী আমরা অনেকেই শুনিয়াছি। মুখ্য কালিদাস দেবীর বয়ে মহাকবি হইয়াছিলেন। এই কাহিনীর মূল কথা হইল যে অধিক বয়সেও মন দিলেই লেখাপড়া শেখা যায়। তাই বলি যে বয়স কিছু বেশী হইয়াছে বলিয়াই যে কেহ লেখাপড়া শিখিতে পারিবে না—এ কথা ঠিক নহে।

সকলকেই লেখাপড়া শিখিতে হইবে। সময়ও যে খুব বেশী লাগে তাহা নয়। রোজ দুই তিন ঘণ্টা সময় মন দিয়া চেষ্টা করিলে তিন মাসেই মোটামুটি লিখিতে ও পড়িতে পারা যায়।

লেখাপড়া জানিলে কত সুবিধা। খররের কাগজ পড়িয়া দেশ-বিদেশের সব খবর জানা যায়। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী পড়া যায়। চিঠি, হিসাব ও দলিল নিজেই বুঝিয়া সুঝিয়া লিখিতে পারা যায়। এইরূপ নানাভাবেই লেখাপড়া আমাদের কাজে লাগে।

তাই আমরা আজ এই শপথ করিলাম—

নিজেরা লেখাপড়া শিখিব।

পরকে লেখাপড়া শিখাইব।

দেশের দুর্নাশ ঘুচাইব।

দেশকে বড় করিব।

আমাদের দেশ

শ্রীশিশিরকুমার বিদ্যোগী

আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ। অতি পুরাতনকালে এখানে ভরত নামে এক জন খুব বড় রাজা ছিলেন। তাঁহার নাম হইতে এ দেশের নাম হইয়াছে ভারতবর্ষ অর্থাৎ ভরতের দেশ। সংক্ষেপে ইহাকে ভারতও বলা হয়। ইহার আর এক নাম হিন্দুস্থান।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে মনুষ্য জাতির বাস। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া সেই জাতি নিজের বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া আসিতেছে এবং সভ্যজগতে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। যুগে যুগে কত জাতির লোক কত রকম সভ্যতা ও নূতন ভাবধারা লইয়া এখানে আসিয়াছে। প্রথমে হয়তো পুরাতন ও নূতন সভ্যতার নানারূপ বিরোধ ঘটিয়াছে, কিন্তু পরে ভারত সকল নূতন সভ্যতাকেই নিজের প্রাণধারার মধ্যে গ্রহণ করিয়া একেবারে আপন করিয়া লইয়াছে। এইরূপে ভারতে এক মহাজাতি গড়িয়া উঠিয়াছে। শত শত বৎসর বিদেশী শাসনে এবং বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতার আওতায় থাকিয়াও ভারত কখনও তাহার স্বকীয়তা হারায়ে নাই। এমন পরকে আপন করিয়া লওয়া জগতে আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারত ছিরদিন পরকে আপন করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে।

“দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে,

যাবে না ফিরে,

এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।”

—রবীন্দ্রনাথ

ভারত এক মহান সভ্যতার উত্তরাধিকারী। যখন পৃথিবীর প্রায় আর সকল জাতিই অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়া ছিল, তখন হইতেই ভারত জ্ঞান ও সভ্যতার আলোকে আলোকিত। তখন ভারতের তপোবনে মুনিঋষিদের আশ্রমে কত লোক নানা বিদ্যা ও জ্ঞান লাভের জন্য আসিয়া নিলিত হইত। তপোবনগুলি বেদগানে মুখর হইয়া উঠিত। বিজ্ঞান ও দর্শনের অনেক সেরা ~~জগৎ~~ জগৎ এই সকল ঋষি ও তাঁহাদের শিষ্যদের কাছে ঋণী।

ভারতের মত এমন একটি আশ্চর্য দেশ পৃথিবীতে আর নাই। ‘যাহা নাই ভারতে তাহা নাই জগতে’। সেজন্য ভারতকে একটি ছোটখাট পৃথিবী বলা যাইতে পারে। ভারতে প্রায় পৃথিবীর পাঁচ ভাগের এক ভাগ লোকের বাস। জগতের প্রধান প্রধান প্রায় সকল ধর্মের লোকই এখানে আছে। এদেশে অনেকগুলি ভাষা প্রচলিত।

ভারতে হ্রদ্য, অর্ধসভ্য ও অসভ্য—সকল রকম মানুষই দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের বিশাল বনগুলি নানারূপ পশু, পাখী, গাছপালা ও ফলফুলে ভরা। ভারতের প্রাকৃতিক শোভার তুলনা নাই। সাধারণ পাহাড়, অতি উঁচু পর্বত, ছোট-বড় নদনদী, গভীর বন, বিশাল সমতলভূমি, ভীষণ মরুভূমি, বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, নানারকম খনি, হ্রদ, সাগর, উপসাগর প্রকৃতি সবই এদেশে আছে। প্রবল শীত, দারুণ গরম, না-শীত না-গরম, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঝড়, তুফান, ঘূর্ণাবর্ত (সাইক্লোন), বরফপাত, নিয়মিত ঋতু-বদল, আরও নানা প্রাকৃতিক ঘটনা—সবই ভারতে ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীর জীবজন্তুর অধিকাংশই এখানে দেখা যায়। বিভিন্ন রকমের জলবায়ুর জন্য এদেশে নানা জাতীয় গাছপালা, ফলফুল ও শস্য জন্মে। এদেশ হুজলা, হুফলা, শস্য-শ্যামলা। মানুষের পরিচিত প্রায় সব রকম ধাতু এবং অসংখ্য খনিজ পদার্থ ভারতের কোথাও না কোথাও পাওয়া যায়। এই সকল কারণে ভারতকে ‘দোনার ভারত’ বলা হয়। তাই কবি গাহিয়াছেন—

“ধনধান্তে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বহুভরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের দেৱা।”

—বিজ্ঞেন্দ্রলাল

ভারত আমাদের জন্মভূমি। আমরা ভারতবাসী—ভারতের সন্তান।
এদেশের ফলে-ফলে-শস্যে আমরা পালিত—জলবায়ুতে বহিত। মা যেমন
আমাদের বড় আপনাত, বড় আদরের, বড় সম্মানের—আমাদের জন্মভূমিও
তেমনি আমাদের বড় আপনাত, বড় আদরের ও বড় সম্মানের। জননী ও
জন্মভূমি স্বর্গের চাইতেও বড়।

“ও আমার দেশের মাটি,
তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা।”

—রবীন্দ্রনাথ

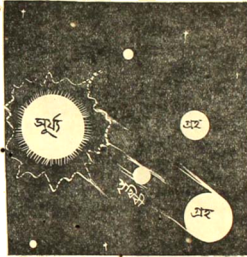
আমাদের আগে কত জ্ঞানী, গুণী, দেশসেবক কত বরকমে দেশের কত
সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা দেশের হিতের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করিতে
এমন কি অকাতরে প্রাণ দিতেও পিছপা হন নাই। আমরাও যেন তাঁহাদের
আদর্শে চলিতে পারি। আমরা সকলে যেন ইনে-প্রাণে আমাদের দেশকে
ভালবাসি—তাহার প্রতি কতব্য পালন করি। ভারত সকল ভারতবাসীর
নিকট হইতেই ইহা প্রত্যাশা করে।

বন্দে মাতরম্!

পৃথিবীর জন্মকথা

ঈশ্বরপ্রদত্ত রায়

কোন লোক যদি সাগর তীরের বালিকণা গুণতে বসে যায় অথবা
সবাই তাকে দেখে মনে করবে—লোকটা পাগল বালিকণা গুণে কি আর

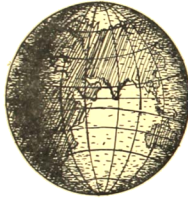


শেষ করা যায় ? সে যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ! দিনের শেষে আকাশের
গায়ে ছোট দীপের মত অসংখ্য তারাগুলি দেখা দেয় । আমরা ঘুমুলেও
তারাগুলি মিটমিট করে সারারাত, সাগরতীরের বালিকণার মত তাদেরও গুণে
শেষ করা যায় না, তারাও লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি । আমরা দেখি তারাগুলি
খুব ছোট, আসলে তারা অনেক বড়—আমাদের এই পৃথিবীর চাইতেও অনেক
বড়, এত বড় যে এক একটা তারাও তিতর লক্ষ লক্ষ পৃথিবী পূরে রাখা চলে ।

এখান থেকে আমরা দেখি—তারাগুলি সব গায়ে গায়ে লেগে

রয়েছে, আসলে একটি তারা আর একটি তারা হতে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে, সব তারাগুলি মিলে যে জায়গাটা জুড়ে রয়েছে সেটা যে কত বড় তা ভেবে কিনারা করা যায় না।

তারাগুলি সবাই এক একটা বিশাল আগ্নেয় গোলক, আমাদের সূর্যও তাদেরই মত। সারা দিনটা সূর্য কি আগুনটাই না ছুড়ায়। আমরা সূর্য হতে অনেক লক্ষ মাইল দূরে কিনা, তাই আমরা গুড়ে মরি না।

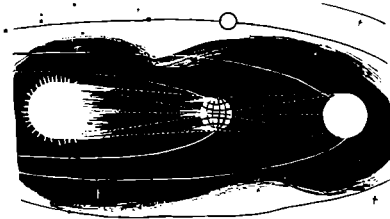


পৃথিবী

সূর্য এবং তারা এদের সকলেরই চলবার একটা নিজ নিজ বাঁধা পথ আছে, সেপথেই তাগ চলে। কঁদাচিৎ লক্ষ লক্ষ বছর পরে একে অন্যের কাছাকাছি এসে পড়ে। তখন তারা একে অন্যকে বলবার সুযোগ পায়—কে হে তুমি ভাই, তোমাঘ ত আর কখনও দেখি নি।

লক্ষ লক্ষ বছর আগের কথা, কত লক্ষ বছর হবে গঠিত বলা যায় না, বিশাল এক তারা চলতে চলতে সূর্যের কাছাকাছি এসে পড়ল। কাছাকাছি অর্থাৎ কয়েক হাজার মাইল বা তার চাইতেও কিছু দূরে, হলে কি হয়? প্রবল জ্বোরে তারাটা সূর্যকে টানতে লাগল, কাছাকাছি এলে এমনটা হয়

যে ঘাঁর জোর বেশী সে ঘাঁর জোর কম তাকে কাছে টানে। টানের ফলে সূর্যের উপরের দিকটায় উঠল এক ঝড়। সেখানকার ভাষণ গরম তরল পদার্থগুলো টগবগ করতে লাগল। সেগুলো ফুলে ফুলে উঁচু পাহাড়ের মত হয়ে উঠল, শেষে টগবগ করতে করতে কয়েকটাইকরো শূন্যে ছিটকে পড়লো। ধীরে ধীরে তারাটা নিজের পথে দূরে চলে গেল। সূর্যের দেহ থেকে ছিটকে-পড়া ~~তরল পদার্থের~~ টুকরোগুলো সূর্য থেকে সরে নাচে নামতে লাগল।



সূর্য হতে পৃথিবীর সৃষ্টি

আগেই বলেছি সূর্য এবং তারগুলি সবাই ভারী গরম, তাদের কাছের জায়গাগুলোও বেশ গরম। আবার তাদের কাছ থেকে ফাঁকা জায়গায় যত দূরে যাওয়া যায় ততই শীতল। শেষটা এত শীতল যে সেখানে কোন পদার্থ গলে জমে বরফ হয়ে যায়। সূর্য থেকে ছিটকে-পড়া টুকরোগুলি ধীরে ধীরে দূরে যেতে লাগল আর শীতল হতে লাগল। শেষে সেই ছিটকে-আসা একটা টুকরো এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছল যেখানে ক্রমে ক্রমে তার তাপ অনেকটা কমে গেল—আর তার ফলে তার বেশীর ভাগটা হল জল আর বাকিটা হল মাটি। সেই জল আর মাটি নিয়েই হ'ল আমাদের এই পৃথিবী।

খোকার বই

শ্রীবীরভ্রকুমার গুপ্ত

খোকা চাহিয়া রহিয়াছে—একভাবে মাঠের পথের দিকে। সেই
দুপুর হইতে বসিয়া আছে। সন্ধ্যা হইয়া গেল।

কোন সকালে খোকার বাবা হাটে গিয়াছেন। বাবার সময় খোকার
মা তাঁহার হাতে হাট হইতে তরকারি ও মাছ কিনিয়া আনিবার জন্য একটা
টাকা ও আরও চারি আনা বেশী দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন—“খোকা, রেঞ্জাই
বই বই করে—চার আনা দিয়া ওর জন্যে একখানা বই এনো”।

খোকা বসিয়া আছে। খোকা ভাবে কি চমৎকার হবে বইখানা।
অনেক ছবি থাকবে। বইখানা খোকা কাউকে দিবেনা। খোকার নিজের
বই—সবাইকে দেখাবে। খোকা সব সময় বই পড়বে।

এদিকে খোকার বাবা হাটের সওদা করেন। দুরকার মত “জিনিষ
কেনার পরও চার আনা হাতে থাকে। খোকার বাবা ভাবেন, এই চার আনা
দিয়ে কি করা যায়।

পাড়ার বিশেষ ডাকে, “চল না, দাদা, আজ নাকি দোকানে খুব ভাল
মাল এসেছে। চল একটু টেনে আসি।”

খোকার বাবা বলেন, “না”।

খোকার বাবা হাঁটিতে থাকেন।

একি তিনি যে তাড়ির দোকানের সামনেই আসিয়া পড়িয়াছেন।

“এসো, এসো, ভায়া” সবাই ডাকে।

কয়েক জন আসিয়া খোকার বাবাকে ধরিয়া ভিতরে লইয়া যায়।

খোকার বাবা ভাবেন, “বাইনা একটু—ঠিক চার আনায়ে যেটুকু পাওয়া
যায়।”

একটু, আর একটু, আর একটু, আর একটু।

খোকার বইএর দাম চার আনা ফুরাইয়া যায়। খোকার বাবা দোকান হইতে বাহিরে আসেন। বইটা আর কেনা হয় না।

খোক একভাবে তাকাইয়া আঁছে।

ঐ যে দূরে বাবা আসিতেছেন। হাতে বাজারের সওদা। খোকার বাবা বই আনিয়াছেন—খোকা বই পড়িবে। খোকা ভাবে আরও কত কী!

বাবা আসিয়া খোকার মাকে বাজারের জিনিষ বুঝাইয়া দেন একে একে।

“কই খোকনের বই?”

খোকার বাবা চুপ করিয়া থাকে।

“ছিঃ তুমি আজও তাড়ি খেলে—ওর বইয়ের পয়সা দিয়ে!”

খোকা আঁশ সামলাইতে পারে না।

দীয়ে দীয়ে ঘরের কোণে সরিয়া যায়।

খোকা কঁাদে, কেবল কঁাদে।

খোকার খুব বেশী অস্থবী—বিকার।

খোকা বলে, “বাবা, কেমন চমৎকার বই! কি মজার ছবি! এ বই আমি কাউকে দিব না।” আবার বলে, “বাবা, বই পড়ব, বড় হ’ব। সবাই ভাল বলবে।”

আবার শোনা যায়, “বাবা, বাবা তুমি তাহলে বই আনলে না?”

খোকার বাবা আর পারেন না। চোখের জলে ভাসেন আর বলেন, “খোকন, মাণিক আমার, ভাল হও, আমি অনেক বই এনে দেব।”

ভগবানকে বলে, “ওকে ভাল করে দাও, চাকুর ওকে ভাল করে দাও। আমি আর তাড়ি খাব না। ওকে ভাল করে দাও।”

থোকা ভাল হইয়া যায় ।

থোকার বাবা আর তাড়ি খান না ।

থোকা লেখাপড়া শিখে ।

থোকা বড় হয়—অনেক টাকা পয়সা আয় করে ।

থোকা বিয়ে করে ।

থোকার বাবা নাতিপুতিদের কোলে করিয়া ‘হুড়ুক’ ‘হুড়ুক’ ~~তাড়ি~~
টানে ।

থোকার বাবা আজ বড় সুখী ।

খরার বচন

পাঁচ রবি মাসে পায় ।

ঝরা কিংবা খরায় যায় ॥

বামুন বাদল বান ।

দখিণা পেলেই ঘান ॥

পথঘাট সাফ রাখ

ঐনির্মল দাশ

বিলাতের রাজপথ : পথ দিয়ে চলেছে এক পথিক। পথিক ভারত-বাসী। হাতে তার কমলালেবু। লেবুর খোসা ছাড়িয়ে ফেলছেন পথিক পথের এধার-ওধার। আর মাঝে মাঝে কমলার কোয়া ফেলছেন মুখে। এমনিভাবেই চলেছেন পথে। চলছেন আর দেখছেন কত কি !

• সারি দেওয়া সাজানো দোকান, ছবির মতন ছোট ছোট খাসা বাড়ী। ধপ্পে পোষাক-পরা ছেলেমেয়ের দল। পথিক দেখছেন আর চলেছেন। পথিক চলেছেন আর কমলার কোয়া মুখে ফেলছেন। মাঝে মাঝে খোসা ছাড়িয়ে ফেলছেন পথের এধার-ওধার। বিতোর হয়ে চলেছেন পথে। ঝকঝকে পরিষ্কার কি চমৎকার দেশ !

সংসা চমক ভাঙে তাঁর। কে যেন অনেক আগে থেকে পিছু নিয়েছে মনে হয়।

পিছন ফিরে তাকান পথিক। দেখেন—এক জন সাহেব। হাতে তাঁর পথিকেরই ছাড়ানো কমলার খোসা। অবাক হন পথিক।

বিদেশী ভারতবাসীকে সাহেব উপদেশ দেন—পথঘাট সাফ রাখতে হয় সব সময়। শরার আর মনের জন্ম দরকার ওটা। তাই, আমি আপনাদের কমলার খোসাগুলো কুড়িয়ে আসছি সারা পথ ধরে। লেবুর খোসায় পা পিছলে কারুর হাত-পাও ত ভাঙতে পারে। এক জনের শরীরের হানি হওয়া মানে তার দেশের হানি।

লজ্জা পেলেন ভারতবাসী। • ভাবলেন—ভারতে গিয়ে পথঘাট সাফ রাখতে দেশবাসীকে বলব।

দুঃখের নদী

শ্রীবারাণসীচন্দ্র চন্দ্র

সেদিন রবিবার। বাণায় কয়েক জন ছেলে এসেছিল। তাদের সাথে নদীর কথা আলোচনা করছিলাম।

ভারতবর্ষ আমাদের দেশ। এর মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায় বহু নদনদী দেশের ওপর দিয়ে বয়ে সাগরে গিয়ে পড়ছে। নদী না থাকলে দেশ মরুভূমি হয়ে যায়, সেখানে লোকজন বাস করতে পারে না। জল না থাকলে মানুষ বাঁচতে পারে না। সেছাড়া জলের এক নাম জীবন। শুধু মানুষ কেন, জল না পেলে পশু, পাখী, গাছপালা, জমির ফসল কিছুই বাঁচে না।

মানচিত্র দেখানোর সময় এক জন শুধালো, আমাদের দেশে এত নদী হল কেন ?

—বেশ ভাল কথা। এর জবাব সোজা। আমাদের দেশের উত্তর সীমানা জুড়ে উঁচু হিমালয় পর্বত দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটি একটি একটানা দেওয়ালের মত। আর দেশের দক্ষিণ দিকে রয়েছে সাগর। রোদের তেজে জল ধোয়ার মত হয়ে উপরে উঠে যায়। এগুলিই মেঘ। এই মেঘ দক্ষিণ বাতাসে দেশের ভিতরে চলে আসে। মেঘ থেকে জল পড়ে। অনেক বহু হিমালয়ে গিয়ে জল চেলে দেয়, কতক বা জমে গিয়ে বরফ হয়ে থাকে। সেই জল নদী হয়ে নেমে চলে আসে। যখন বাধল থাকে না তখনও বড় বড় নদীর জল শুকাই না। বরফ-গলা জলে তখন নদী তাজা থাকে।

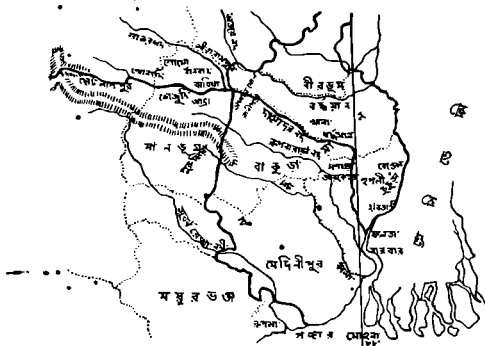
আর একজন বলল, নদী আমাদের উপকার তো করেই, কখনো অপকার করে কি ?

—হাঁ, অপকার করে বৈ কি ! এই জন্মই তো আমাদের দেশের এক নদীর নাম দেওয়া হয়েছে ‘ছঃখের নদী’।

ছঃখের নদীর কথা শুনে সবাই সচকিত হয়ে উঠল। জলধর বলল, এ নদীর কথা আমাদের বলুন না।

সুঃখের নদী

—বাংলা দেশের পশ্চিমে বিহার। এখানকার ছোটনাগপুরের দুই হাজার ফুট উঁচু পাহাড় থেকে এই নদীটি বেরিয়েছে। তারপর বিহারের



মধ্যে একশ আশী মাইল পথ বয়ে এসে বীকানুর জেলার মধ্যে ঢুকেছে। বর্ধমান শহরের কাছে এসে নদীটি দক্ষিণ মুখে ঘুরে গেছে। তারপর হুগলী ও হাওড়া

জেলার ভিতর দিয়ে চলে এসে হুগলী নদীতে মিশেছে। এ নদীর নাম দামোদর।

দামোদরের সাথে বাংলাদেশের আর কোন বড় নদীর মিল নাই। রুখো-শুকোর দিনে—আশ্বিন মাস থেকে বৈশাখ মাস অবধি—দামোদরের জল খুব কমে যায়। মনে হয় নদী মরে গেছে। বর্ষাকালে আবার জলে ভরে ওঠে। এ সময় পাহাড়ে ঘনি ঢল নামে তবেই বিপদ। বানের জুল-ভীষণ বেগে নদীর দুই কূল ডুবিয়ে দিয়ে মানুষের ঘরদোর ভাঙিয়ে নিয়ে যায়। মাঠের ফসল ধুয়ে মুছে যায়, কত মানুষ মারা পড়ে, কত জানোয়ার ভেসে যায়। এইভাবে বহুলোকের জীবনে দুঃখ নিয়ে আসে বলে দামোদরকে বলা হয় ‘দুঃখের নদী’।

অভয় বুড়ো মানুষ। ঘরের এক কোণে মেজ্ঞেতে বসে সে আমাদের কথা শুনছিল। অনেকবার সে দামোদরের বানের কথা শুনেছে। সে বলল, মানুষতো কত কি তৈরী করেছে। তারা আকাশে উড়ন্ত পারে, জলের নীচ দিয়ে চলতে পারে। তবু একটা নদীর বান ঠেকাতে পারে না ?

অভয়ের কথা শুনে সবাই কৌতুক বোধ করল। আমি হেসে বললাম, পারেই তো! দামোদরের বান রুখবার আয়োজন চলেছে। শুধু বান ঠেকানো নয়, নদীর জল নালা দিয়ে মাঠে চালিয়ে দিয়ে ফসল কলানো হবে; নদীতে তখন বারো মাস জল থাকবে।

জলধর বলল, বারো মাসতো বৃষ্টি হয় না। তবে দামোদরে জল থাকবে কেমন করে ?

—জল ধরা হবে বাঁধ দিয়ে। কেমন করে, কোথায় বাঁধ দেওয়া হবে তাও ঠিক হয়েছে। বিহারের ভিতর বরাকবু, বোকারো ও আরো কয়েকটি নদী এসে দামোদরের সাথে মিশেছে। এই নদীগুলির ওপর সাতটি বঁজবুত উঁচু বাঁধ দিয়ে জল আটকে রাখা হবে। পাহাড়ে দারুণ ঢল নামলেও

তখন হু হু করে জল নেমে এসে বান আনতে পারবে না। কল ঘুরিয়ে বীধের দরজা দরকার মত কম বা বেশী করে খুলে দেওয়া হবে। তার ফলে সারা বছরই নদী জলে ভরা থাকবে। তখন দামোদর হবে হুঃখের নদী।

যেখানে যেখানে বীধ দিয়ে জল ধরে রাখা হবে সেখানে সেখানে কল বনিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। এই বিদ্যুৎ আশেপাশের সহরে ও গ্রামে নিয়ে যাওয়া হবে। বিদ্যুতের সাহায্যে গ্রামে গ্রামে বিজলী আলো পাওয়া যাবে, ছোট ছোট কলকারখানা চালানো যাবে। লোকদের নানা উপায়ে রোজগারের ও সুবিধা হবে।

জলধর আবার শুধানো, বাংলাদেশের মধ্যে কোথাও বীধ তৈরী হবে না ? আসানসোলার পূর্বদিকে দুর্গাপুর নামক জায়গায় দামোদরের ওপর একটা আলি বীধ দেওয়া হবে। আলি বীধ দিয়ে জল ধরে রাখা হয় না ; জলের ধারার মোড় কিরিয়ে দেওয়া হয়। এ বীধ দিয়ে খাল ও নালায় জল চালিয়ে দিয়ে মাঠে সেচ-কাজের সুবিধা করে দেওয়া হবে। এর ফলে যেসব মাঠে এখন মোটেই ভাল ফসল হয় না, সেখানে প্রচুর কসল ফলবে। তাছাড়া নদীতে যদি সারা বছর জল থাকে তাহলে কত সুবিধা। নদীতে মাছ পাওয়া যাবে ; নৌকাপথে যাতায়াত করা, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নৌকায় করে মাল পাঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য—এ সবের কত সুবিধা হবে !

সবাই মন দিয়ে শুনছিল। বিনয় বলল, এ সব বীধ তৈরীর কাজ নৈষ হতে কত দিন লাগবে ?

—বছর দশেক লাগবে বলে অনুমান করা হয়েছে। ধারা একাজ করবেন তাঁরা। এ সব জায়গা খুব ভাল করে দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হিসাব করে কাজ শুরু করেছেন। দামোদরের বান চেকানো, বীধ দিয়ে জল ধরে রেখে বিদ্যুৎ তৈরী করা, জল সেচ করে জমির কসল বাড়ানো—এ সবের আয়োজন করা হয়েছে। এই কাজের নাম দেওয়া হয়েছে “দামোদর পরিকল্পনা”।

বিনয় বলল, দামোদর পরিকল্পনায় আমাদের আশার কথা রয়েছে। কেবল মনে ভয় হয়, যা শুনলাম তা সব সত্যি হবে তো ?

আমি না হেসে থাকতে পারলাম না। বললাম, এ সবই সত্যি ; কিছুই আজগুবি নয়, কারো খামখেয়ালিও নয়। মানুষ মাথা খাটিয়ে কিনা করেছে ! নদীতে বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখা নতুন কথা নয়। মিশর দেশে নীলনদের জল এইভাবে ধরে রেখে মাঠে জলসেচ করা হয়। আমাদের দেশেও এরূপ বাঁধ তৈরী হয়েছে। বোম্বাইয়ের কাছে নর্মদা নদীর বাঁধ দেশের খুব উপকারে লাগছে। নর্মদার বাঁধের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তা দিয়ে আহমদাবাদের কাপড়ের কলকারখানা চালানো হয় এবং আলো দেওয়া হয়।

আমেরিকায় টেনেসি নদীতে বাঁধ দিয়ে জল ধরে রেখে নানা কাজে লাগানো হয়েছে। তার ফলে মেদেশের মরুভূমির মত অনেকখানি জায়গা হজলা, ফকলা হয়েছে। দামোদর পরিকল্পনা টেনেসি পরিকল্পনার ছাঁচেই তৈরী। টেনেসি পরিকল্পনার কাজ হাতেকলমে করেছেন এমন লোকেরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। দামোদর পরিকল্পনার কাজ শেষ হলে কিছুদিনের মধ্যেই বিহার ও পশ্চিম বাংলার কতক অংশ হজলা ও ফকলা হয়ে উঠবে। লোকেরা তখন হুদিনের নাগাল পাবে, আর ‘হুখের নদী’ তখনই হবে সত্যিকারের ‘হুখের নদী’।

2008

RECEIVED
JAN 2008



সম্পাদক

• ডাঃ পরিমল রায়

শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিম বঙ্গ

প্রকাশক—ঐতিহাসিক রায়

পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তার পক্ষে.

হাইটাস বিল্ডিং, কলিকাতা

মুদ্রক—ঐক্যবন্ধন রায়

প্রবর্তক প্রতিষ্ঠা এণ্ড প্রাইন্টিং লিমিটেড

৪২/৩ বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা-১২